ভোরের কাগজ

5 APR 2003

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রদানে ঘাপলা

গত জুলাই থেকে সরকার সারা দেশের সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রথা চালু করেছে। নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শতকরা ৩৩ জন গরিব, অসহায়, ভূমিহীন পরিবারের ছাত্রছাত্রী প্রতি মাসে জনপ্রতি পাবে ১০০ টাকা। একই পরিবারের একাধিক ছাত্রছাত্রী পাবে ১২৫ টাকা। এর আগে ১৯৯১ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চালু ছিল শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি।

১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে ২০০২ সালের জুন মাস পর্যন্ত চালু ছিল 'শিবিখা'। তবে এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছিল না। ১৯৯১ সালের শুরুতে প্রতিটি জেলার একটি উপজেলার একটি ইউনিয়ন এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি পায়। এখানে নিয়ম বেঁধে দেওয়া ছিল শতকরা ৩৩ জন ছাত্রছাত্রী প্রতি মাসে পাবে ১৫ কেজি চাল অথবা গম। '৯১ সাল থেকে '৯৯ সাল পর্যন্ত গম উত্তোলন ও বিতরণের ক্ষমতা ছিল স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির হাতে। বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক চাহিদা তৈরি করে আগের মাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে দাখিল করতো, পরের মাসে চাহিদা অনুযায়ী গম-চাল দেওয়া হতো। এই কর্মসূচির আওতায় ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ গম-চাল আত্মসাৎ করেছে। বহু সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক গম-চাল কালো বাজারে বিক্রি করে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কালো বাজারে গম-চাল বিক্রির খবর যখন জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রকাশ পেতে শুরু করে তখন সরকার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিটি ইউনিয়নে ডিলার নিয়োগ করে। প্রধান শিক্ষকরা সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীর তালিকা তৈরি করে কার্ড তৈরি করে এবং ডিলার প্রতিটি কার্ডে চাল-গম বিতরণ করে। ডিলারগণও বিপুল পরিমাণ ঘাপলা করা শুরু করে।

গম-চাল বিতরণে সরকার যতো বিকল্প ব্যবস্থা নেয় বিতরণকারীরা নেয় অন্য বিকল্প ব্যবস্থা।

২০০২ সালের জুলাই মাস থেকে সরকার সকল ব্যবস্থা পরিবর্তন করে প্রতিটি সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীকে ১০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাই মাস থেকে তা কার্যকরও করে। প্রতিটি সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীর মা'র নামে স্ব-স্ব ব্যাংকে হিসাব খোলা থাকবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অভিভাবক-মাতা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এই ব্যবস্থা করা হয় যাতে কোনো ভুয়া ছাত্রছাত্রীর নাম দিয়ে প্রধান শিক্ষক বা সভাপতি টাকা উত্তোলন করতে না পারে সেজন্য। প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি শুধু তালিকা তৈরি করে শিক্ষা অফিসে দেবে। শিক্ষা অফিস দেবে ব্যাংকে। এখানেও টাকা আত্মসাতের বিকল্প ফন্দি তৈরি! গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের টাকা দেওয়া হয়েছে চলতি মাসে। দুই কিস্তিতে এ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশ, এখানেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করছে। উপবৃত্তির এ টাকা অভিভাবকদের উত্তোলনের কথা থাকলেও (স্ব-স্ব ব্যাংক থেকে) কিন্তু সহকারী শিক্ষা অফিসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক ব্যাংক ম্যানেজারদের সহযোগিতায় টাকা উত্তোলন করে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে বসে বিতরণ করেছে। এ অর্থ বিতরণ ক্ষেত্রেও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে– প্রতিটি সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শতকরা ২০ টাকা হারে আদায় করে নিচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে, এতেও লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করছে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি। ব্যাংক ম্যানেজার ও সহকারী শিক্ষা অফিসারও পাচ্ছে এর একটি অংশ।

ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে প্রধান শিক্ষকরা হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। সরকার দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে যতো কঠোর ব্যবস্থা নেয় প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও দুর্নীতির নতুন ফন্দি বের করে। সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রেখেছে এবং সরকারি টাকা ঠিকমতোই বিতরণ দেখানো হচ্ছে কিন্তু সুবিধাভোগীরা পাচ্ছে না। পাচ্ছে বিতরণকারীরা। সরকার শিশুশ্রম বন্ধে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও টাকা দিয়ে শিশুদের স্কুলগামী করে জাতিকে শিক্ষিত করার যে মহতী উদ্যোগ নিয়েছে, শিক্ষকরা সেখানে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে প্রকল্পকে ভেস্তে দিচ্ছে।

উপবৃত্তির টাকা যাতে প্রতিটি সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রী নিয়মিত পায় এবং বিতরণে যেন কোনো দুর্নীতি না দেখা দেয় সে ব্যাপারে সরকারি কর্মসূচিকে আরো কঠোর হওয়া প্রয়োজন। উপবৃত্তির টাকা বিতরণে সরকার কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীরা তাদের অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত না হয় দেশবাসীর এটাই প্রত্যাশা।

❑ এম আলতাফ মাহমুদ